মুক্তিযুদ্ধে গণমানুষের ভূমিকা

-মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া (অব.)

এক.

একাত্তরে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এ দেশের গণমানুষের অকুণ্ঠচিত্তের সমর্থন ও সার্বিক অংশগ্রহণের এক অনুপম দৃষ্টান্ত। এমন জনযুদ্ধ পৃথিবী আর দেখেনি। জনযুদ্ধের বহুমাত্রিকতায় সর্বোচ্চ ত্যাগের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন এ দেশের মাটিবর্তী মানুষ, অসাধারণ ঋজুতা নিয়ে। এই আমজনতাই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মূল নায়ক। অপরদিকে সশস্ত্র বাহিনী, ইপিআর, পুলিশ, আনসার ও মুজাহিদ বাহিনীতে কর্মরত বাঙালি সদস্যরা যারা প্রশস্ত বুকে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে লড়েছেন তাদের কাহিনীও অনুপম অহংকারের। এ যুদ্ধ করেছে সাধারণ মানুষ। এমন সাধারণ হতে আসাধারণ গুনাবলির প্রয়োজন। বস্তুত প্রায় এক লাখ বিশ হাজার গণযোদ্ধা আর জনগণের সাথে মিশে পেশাদার সৈনিকরাও জনযুদ্ধের গণযোদ্ধাই হয়ে গিয়েছিল।

এ লেখায় যখন মুক্তিযুদ্ধ শব্দটি বলছি তখন আমি একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের সশস্ত্র সংগ্রামের কথাই কেবল বলছি। রাজনৈতিক বিবর্তন ছাড়া যুদ্ধ অনিবার্য হয়না। কোনো দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বকথা গণমানুষের বঞ্চনার মনস্তত্ত্ব, ইংরেজীতে যাকে বলে Deprived Psychosis.

স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রসঙ্গে বলতে বা লিখতে গেলে জনগণের ভূমিকা সম্বন্ধে সচরাচর যা বলা হয় তা হলো- বাংলাদেশের ছাত্র, কৃষক, জনতা, পেশাজীবী শ্রেণীগোত্র নির্বিশেষে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তারপর আলোচনার চরিত্র ক্রমাগত সীমিত হয়ে আসে অল্প কিছু রাজনৈতিক নেতা, কিছু সামরিক ব্যক্তিত্ব, কিছু বুদ্ধিজীবী এবং আরো অল্প কিছু নির্বাচিত ব্যক্তির মধ্যে। সাড়ে সাত কোটি জনগণের জন্য বরাদ্দ রইলো ওই একটি লাইন, কখনোবা একটি প্যারাগ্রাফ বড়জোড়। ঐতিহাসিকরা গ্রহণের চেয়ে বর্জন করেন বেশি-অমলেশ ত্রিপাঠির এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। ইতিহাস লিখতে গিয়ে একজন ঐতিহাসিক সব ঘটনা তো লিখতে পারেন না, যে সব ঘটনা তিনি ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক বলে বিবেচনা করেন তাই শুধু গ্রহণ করেন। এই পছন্দ-অপছন্দ নির্ভর করছে ঐতিহাসিকের মনন ও মনস্তত্ত্বের ওপর। জনযুদ্ধের এসব গণযোদ্ধা ঐতিহাসিকদের গ্রহণ-বর্জনের যে ছাকনি, তার ভেতর দিয়ে বার বার নিচে পড়ে গেছে। তারা না পেরেছে নিজেদের কথা লিখতে, না পেরেছে ঐতিহাসিকদের কলমে বা কথায় উঠে আসতে। অল্পশিক্ষিত, অশিক্ষিত এবং সমাজের নিচুতলার এ যোদ্ধারা স্বাধীনতা উত্তরকালে নিজেরাও তাদের সেই লড়াইয়ের কথা কোথাও বলতে পারেনি, বলতে অনুরুদ্ধও হয়নি। এ সুযোগ হরণ করে নিলো রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী ও সামরিক বাহিনীর কিছু মুক্তিযোদ্ধা।

একাত্তর এ জাতির সবচেয়ে স্বরণীয় সময় - বেশিটাই গর্বের, যদিও গ্লানির অংশও একেবারে কম নয়। মার্চ- ডিসেম্বর সময়টা এ জাতির পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক কাল। ষষ্ঠ শ্রেনীর ছেলে আলম নীলফামারীর ছাতনাই-বালাপাড়ার যুদ্ধে হাতে, কোমরে, আটটি গুলিতে আহত হলো। ভুরুঙ্গামারীর গেরস্তের কামলা ছেলে খালেক হাতিবান্ধার যুদ্ধে শত্রুর অপ্রতিরোধ্য মেশিনগান পোস্টে গ্রেনেড ছুড়ে তা স্তব্ধ করে দিলেও নিজে মারাত্বক আহত অবস্থায় শত্রুর হাতে ধরা পড়লো এবং অমানুষিক নির্যাতনের পর নিহত হলো। তিরিশের কোঠার মদন থানার সলাজ চাষানী মিরাশের মা’র রক্তে স্বাধীনতার বান বইলো-পাঁচজন সতীর্থ যোদ্ধার সাথে এক কোম্পানি শত্রুর অগ্রাভিযান এবং নদী অতিক্রম ঠেকিয়ে দিলো-পাল্টে গেলো মগড়া নদীর পানির রং-শত্রুর রক্তে লাল পানি বইলো মগড়ায়।

অন্যদিকে বহু বিদ্বান ব্যক্তি এ যুদ্ধে মাঠে নামতে পারেননি। পারেননি কারণ-এ যুদ্ধ কেবল বিদ্যা ও বুদ্ধির যুদ্ধ ছিল না। এ যুদ্ধ ছিল নিরেট দেশপ্রেম, বাঁধভাঙা সাহস আর সুতীব্র আবেগের একটি কঠিন সংমিশ্রন। কলমের কাজ অস্ত্র দিয়ে হয় না। তেমনি তার উল্টোটাও সত্য। আর যখন এই রক্তের ডাক এলো তখন যুক্তি দেয়া হলো-সবাই যদি রাইফেল হাতে যুদ্ধে যাবে, তবে এই বৃহত্তর সংগ্রামের মেধার জোগান আসবে কোত্থেকে শেষমেষ রাইফেল হাতে নেবার দায়িত্ব পড়লো এই আমজনতার ওপর। এরা অসাধারণভাবে সাধারণ। জনযুদ্ধের এরাই নায়ক-এরাই সেই গণযোদ্ধা।

দুই.

একত্তরে কুমিল্লার চান্দিনা এলাকায় থানার সামনের রাস্তাটা পশ্চিম দিকে শ'দেড়েক গজ গিয়ে মোড় নিয়ে পঁচিশ গজের মতো গিয়েছে উত্তর দিকে। তারপরই পশ্চিম দিকে বাঁক নিয়ে চলে গেছে মাধাইয়া, ইলিয়টগঞ্জ হয়ে দাউদকান্দি। দ্বিতীয় মোড়ের লাগোয়া পূর্ব দিকে একজোড়া বাঁধানো কবর। এখান থেকে পশ্চিম দিকের কয়েকশ' গজ পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারে বাজার, বাসস্টেশন, টেলিফোন এক্সচেঞ্জসহ থানা সদরের যাবতীয় স্থাপনা। কবরগুলোর কাছেই রাস্তার উত্তরপার্শ্বে বিশাল কয়েকটি পাটগুদাম। আমরা খোঁজখবর নিয়ে নিশ্চিত হলাম চান্দিনা থানা থেকে পশ্চিমে বাজার পেরিয়ে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অবধি পাকসেনাদের ছোট দল রাতে পেট্রোলিং করে। এদের অস্ত্র সাধারণত হাতে কিংবা স্লিং এর সাহায্যে কাঁধে ঝোলানো থাকে। মুক্তিবাহিনীর সাথে এ যাবত এদের কোনো মোকাবেলা হয়নি। এ পেট্রোলিং তাই গা-ছাড়া ধরণের নৈমিত্তিক কাজে রুপ নিয়েছে। এম্বুশের জন্য রণকৌশলগত বিবেচনায় সব দিক দিয়ে আদর্শ টার্গেট। আমরা এ পেট্রোল এম্বুশের পরিকল্পনা করলাম।

একহারা গড়নের লোক আব্বাস। উপরের পাটির মাঝখানের কয়েকটি দাঁত সবসময়ই উলঙ্গ থাকে। বর্ণ পরিচয়হীন এ লোকটি শ্রম বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। সে মুক্তিযোদ্ধা নয়, যুদ্ধের কোনো প্রথাগত প্রশিক্ষণও তার নেই। যুদ্ধের শুরু থেকেই সে আমাদের সাথে আছে। গায়ে শক্তি নেই, কিন্তু মনের শক্তি অফুরন্ত। যুদ্ধ সংক্রান্ত যে কোনো কাজের জন্য সে একপায়ে খাড়া। বুঝশক্তি কম, বোধশক্তিও ভোঁতা। আব্বাসের সাথে আমাদের কোনো পূর্বপরিচয় নেই। আমাদের সঙ্গে একটা কোষা নৌকা ছিল। নৌপথে রেকি বা যাতায়তের জন্য আমরা এটাকে ব্যবহার করি। আব্বাস এ নৌকার মাঝি। আমাদের সঙ্গে থেকে থেকে আব্বাস আমাদেরই একজন হয়ে গেছে। আমাদের সব কাজেই তার সীমাহীন উৎসাহ। যেহেতু আমাদের কোনো বেতার যোগাযোগ ছিল না, তাই খবর আদান-প্রদান করতে হতো লোক মারফত। আব্বাস সেজন্যও অত্যন্ত কার্যকরী বার্তাবাহক। শুধু বিশ্বাসযোগ্যতার কারণেই নয়, তার চলাচলের দ্রুততার জন্যও। ও হাঁটতে পারতো না, দৌড়াবার মতো ছিল তার ছন্দোবদ্ধ চলন। ক্ষুধা নেই, পিপাসা নেই-শ্রান্তিহীন এক কর্মী। লগি, বৈঠা, হাতিয়ার-তার দুটো হাত সবকিছুর জন্যই সই।

একাত্তরের সেপ্টেম্বর। রাত সাড়ে বারোটার দিকে আমরা পাঁচজন পৌঁছলাম বাজারের উত্তর দিকে থেকে এসে। কবরগুলোর কাছে রাস্তার লাগোয়া উত্তর পাশে শূন্য পাটের গুদামে রাস্তার দিকে মুখ করে অবস্থান নিলাম। ঘরের কিছু অংশ খুঁড়ে ফায়ার করার সুযোগ করতে হলো। আব্বাসও আছে আমাদের সাথে। সবার কাছে এসএমসিসহ ২৮ রাউন্ড করে দুই ম্যাগাজিন ভর্তি গুলি। কঠোর নির্দেশ দেয়া আছে-আমি গুলি করার আগে কেউ গুলি করবে না এবং বন্ধ করতে বলা মাত্রই সবাই গুলি বন্ধ করবে। আমাদের পশ্চাদপসারণের পথ এবং মিলনস্থান পূর্ব নির্ধারিত ছিল। তবুও আমরা একেবারে নির্ভয়ে ছিলাম না। দালালদের গায়ে সাইনবোর্ড থাকে না। তাছাড়া ভেতরে পশু হলেও গড়ন তো মানুষেরই মতো। রাত দু'টার কিছু বেশি বাজে। চাঁদনি রাত। নিশ্চুপ অপেক্ষা করছি। স্পষ্ট দেখতে

পাচ্ছি পাঁচজন পাকিস্তানি সৈন্য কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে গল্প করতে করতে থানার দিক থেকে বাজারের দিকে আসছে। আব্বাস আমার পাশে। রাতের নিস্তব্ধতায় ওদের কথা পরিস্কার শোনা যাচ্ছে। ওরা তখনো প্রায় পনেরো গজ দূরে। আমাদের সামনে এলে দূরত্ব হবে পাঁচ গজের কাছাকাছি। পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি একজন বলছে, 'শালা মুক্তিলোগ কিধার হ্যায়? উনকো পাতা নেহি মিলতা হ্যায়।' আব্বাস উর্দু জানে না, অর্থ বোঝারও কথা নয়। শিশু হোক আর পশু হোক-আদর, স্নেহ, ঘৃনা, অবজ্ঞা, ভালোবাসা সবাই এসবের মর্ম বোঝে। হয়তো তেমনই কিছু একটা বুঝল আব্বাস। আমার কোনো অনুমতির অপেক্ষা না করেই বলে উঠলো, 'স্যার, আমি পাতা মিলাইয়া দেই?-বলেই ফায়ার। এক লম্বা বার্স্টে বোধহয় এক ম্যাগাজিনের গুলি ওর শেষ হয়ে গেল। ক্ষণভঙ্গুর সেই মুহূর্তে আমাদের সময় নষ্ট করার সময় ছিলো না। উপর্যুপরি কয়েক বার্স্ট ফায়ার করে ওদের মৃত্যু নিশ্চিত করলাম।

পাকিস্তানিদের সঙ্গে মুরাদনগর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের ভালো ওঠাবসা এবং ঘনিষ্ট আলাপ পরিচয়। আমাদের সাথে কথা বলার প্রস্তাবে 'হ্যাঁ বা না' কিছু না বললেও পরে প্রাণের ভয়ে নিজ উদ্যোগে আমাদের সঙ্গে খোলা মনে আলাপ করলেন। মুরাদনগর-কোম্পানীগঞ্জ এলাকায় পাকিস্তানিদের অবস্থান ও সংখ্যা ভদ্রলোক সঠিক এবং নির্ভুলভাবে আমাদের দিতে লাগলেন। তার দেয়া খবরাখবরের ভিত্তিতে অপারেশন পরিকল্পনার তথ্য সংগ্রহের জন্য আব্বাস ও আমি নৌকা নিয়ে মুরাদনগর থানা এলাকায় শত্রু অবস্থান রেকি করতে রওনা হলাম। নৌকা দুরে কোথাও রেখে বেশ কিছু হাঁটাহাটি আছে। চার/পাঁচ ফুট পানির উপর মসৃন আঁচলের মতো ধানক্ষেত। নৌকার পাটাতনের নিচে বাঁশের মাচার উপর আমাদের হাতিয়ার। আমরা মুরাদনগর থানার উত্তরে করিমপুর গ্রামের কাছে আসতেই রাস্তার উপর জড়ো হওয়া কিছু লোক আমাদের নৌকা পাড়ে ভিড়াতে বললো। আব্বাস সাথে সাথেই নৌকা থামিয়ে দিল। পরক্ষণেই দেখলাম কিছু লোক বর্শা, কোচ, রামদা নিয়ে আমাদের নৌকার ধরার জন্য এগিয়ে আসছে। আব্বাস বললো 'স্যার, শালাগো সব লাশ ফালাইয়া দেই ?' আমি ধমক দিয়ে বললাম, 'তুমি নৌকা ঘোরাও।' আব্বাস তবুও এসএমসি বের করে পাটাতনের উপর রাখলো। নৌকা ঘুরিয়ে লগি বাইছে সে সর্বশক্তিতে। হঠাৎ দেখি এক লোক বুক পানিতে নেমে আমাদের নৌকার সামনে দু'হাত প্রসারিত করে নৌকা থামাতে বলছে। এ লোকটি যে কোন দিক দিয়ে এসেছে আমরা খেয়ালই করিনি। আমার দৃষ্টি ছিল 'শহীদী' দরজা পাবার জন্য যারা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল তাদের দিকে। আমি লোকটিকে সড়ে দাঁড়াতে বললাম। বললাম যে এক্ষুণি সড়ে না দাঁড়ালে গুলি করবো। কিছুই হলো না। লোকটি দু'হাত দিয়ে নৌকা ধরে দাঁড়িয়ে রইলো। ধাবমান 'জেহাদী'রা পানি ভেঙে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। আর সময় দেয়া গেলো না। লোকটির উরুতে গুলি করলাম। সে পানিতে পড়ে গেলো। আব্বাস প্রাণপণে লগি বাইছে। আমার হাত 'কক' করা এসএমসি-র ট্রিগারের উপর, দৃষ্টি প্রসারিত। দূরে কয়েকটি গুলির শব্দ শুনলাম। রাজাকারদের গুলি লক্ষ্যবস্তুতে লাগে না। আমাদের গায়েও লাগলো না। আমরা নিরাপদ স্থানে পৌঁছে গেলাম। আব্বাস কাঁচা রাস্তার উপর সটান হয়ে শুয়ে পড়লো। তার মুখের দু'কোনায় ফেনা। আমার মাথা ঝিম ঝিম করছে। আব্বাসকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরবো, মনেই রইলো না।

যত সাধারণই হোক না কেন, বলবার মতো প্রত্যেকেরই আপন আপন কিছু গল্প থাকে। মোকছেদেরও আছে। পেশিবহুল সুঠামদেহী পুরুষ মোকছেদ। সুন্দর একটি কোষা নৌকা তার। নৌকাটি নিয়ে সে আমাদের সাথে থাকে। কবে, কোথায় সে আমাদের সাথে তার নৌকাটি নিয়ে এসেছিল মনে পড়ে না। প্রয়োজনও ছিলো না। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেও বিয়ে করেনি মোকছেদ। গাঁ-গেরামে এ বয়সে এক ঘর পোলাপানের বাপ হওয়া যায়। তিতাস নদীতে মোকছেদের নৌকায় বসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মোকছেদ বিয়ে করোনি ক্যান?' মোকছেদ হাসতে হাসতে বললো, 'বিয়ে আর করতাম না।' 'ক্যান?' হঠাৎ হাসি মিলিয়ে গেল মোকছেদের। নৌকায় বসে মাঝির চোখে চোখ রেখে কেউ গল্প করে না।

তবুও কেন জানি ঘুরে তাকালাম মোকছেদের দিকে। দূরে ঈশান কোনে মেঘটা ঠায় দাড়িয়ে রইলো। ভর দুপুরে অন্ধকার হয়ে এলো বেলা। পূর্বদিকে ঘোড়াশাল গ্রাম পার হয়ে কোষা নৌকা চলছে। আমাদের মোকছেদ নৌকা বাইছে কী বাইছে না, তার নিজেরও খেয়াল নেই। ক'সেকেন্ডে বহু বছরের অতীত পথ ঘুরে ফেললো মোকছেদ। বললো, 'স্যার' হেইডা একটা সাগর। জীবনে কিছু কিছু কথা থাকে, যা সবাইকে বলা যায়। কিছু কিছু কথা থাকে যা কিছু কিছু লোককে বলা যায়। কিছু কথা থাকে শুধুমাত্র একান্ত এক-দুইজনকে বলা যায়। তারপরও কিছু কথা থাকে জীবনে যা কাউকে বলা যায় না। মোকছেদের সেই 'সাগর' কাউকেই বলবার নয়। বেদনাবিধূর এক মধুর অতীত, একান্তই আপনার। বললাম, 'মোকছেদ কালাডুমুর পৌঁছতে আর কতক্ষণ লাগবে?' মোকছেদ আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য ভালোই বুঝলো। নিরুত্তর নৌকা বেয়ে চললো মোকছেদ। প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি আমারও প্রয়োজন ছিল না। আমিও যেনো কী ভাবছিলাম! এর মধ্যে ঘন্টাখানেক সময় হয়তো পার হয়ে থাকবে। মোকছেদ মুখ খুললো আবার, 'স্যার আমরাও মানুষটি সাড়ে তিন আত, পাঞ্জাবিরাও মানুষটি সাড়ে তিন আত, খাইছে কেবল তারার ওই দেড় আইত্যাডায় (দেড় হাতি অস্ত্রটায়)। আমরারেও দেন স্যার অস্ত্র। দেশ আবার সাদিন অয় না ক্যামনে দেহি।' মোকছেদকে অস্ত্র দেয়া হয়নি। ওকে অস্ত্র দেয়া যায় না। কেন দেয়া যায় না ওকে সেটি বোঝাবার চেষ্টা করলাম না। অস্ত্র ছাড়াই এক আশ্চার্য যুদ্ধ করেছে মোকছেদ।

কুমিল্লা-দাউদকান্দি সড়কের উপর ইলিয়টগঞ্জ এবং মাধাইয়া বাজারের মাঝামাঝি স্থানে যে সেতুটি, সে এলাকার নাম খাদঘর। মোকছেদ একদিন বললো, 'স্যার, কয়ডা পাঞ্জাবী আর পাঁচ/ছয়ডা রাজাকার পোলডা পাহারা দেয়। ইডিরে ধইরা লইয়া আই?' 'ক্যামনে' আমি জানতে চাইলাম। মোকছেদ মনে মনে এ পরিকল্পনা যে বুহুদিন যাবত করেছে তাতে কোনো সন্দেহ রইল না। দেখলাম তার পরিকল্পনার কমা-সেমিকোলগুলোও সে যথাস্থানে বসিয়েছি। দু'জন ছেলে এসএমসি নিয়ে গায়ে চাদর জড়িয়ে বেবিটেক্সিতে মাধাইয়া বাজারের পশ্চিম দিক থেকে ইলিয়াটগঞ্জের দিকে রওনা হবে। বেবিটেক্সি খাদঘর সেতুর কাছে এলে পাঞ্জাবিরা বা রাজাকাররা আরোহীদের তল্লাশী করতে থামাবে। আর যদি না থামায় তবে তারা নিজেরাই সেতুর পূর্বদিকে শত্রুর বাংকারের কাছে থামবে। ফলে নিশ্চিত যে শত্রুর কেউ না কেউ বেবিটেক্সি থামার কারণ জিজ্ঞাসা করতে আসবে। এমন অবস্থায় অস্ত্র হয় থাকবে শত্রুর কাঁধে অথবা ঝুলন্ত অবস্থায় তাদের হাতে। যেহেতু বেবিটেক্সিতে আমাদের ছেলেরা গুলি করার জন্য প্রস্তুত থাকবে-সেহেতু মুহুর্তেই তাদের উপর গুলি করা যাবে এবং পরক্ষণই বাকিদের হত্যা করা যাবে-কেননা কয়েক সেকেন্ডে তারা যুদ্ধের জন্য তৈরী হতে পারবেনা। আমাদের কিছু ছেলে আগেথেকেই অবস্থান নিয়ে থাকবে লাগোয়া উত্তর দিকের গ্রামে। অতএব, ওদের হত্যা করা এবং শত্রুর সব অস্ত্র দখল করা যাবে। মোটামুটি এই ছিল সংক্ষেপে মোকছেদের পরিকল্পনা। অতিমাত্রায় উচ্চকাঙ্খী ও সাহসী পরিকল্পনা, সন্দেহ নেই। আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। অপূর্ব এ রেইডের পরিকল্পনা মোকছেদের মাথায় এলো কী করে ? মোকছেদকে তার এই পরিকল্পনার ওপর কোনো মন্তব্যই করলাম না। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করবো বলে মনস্থির করলাম। রণকৌশলগত কারণে এ পরিকল্পনায় কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে হলো। তবে মোকছেদই রইলো এ পরিকল্পনার মূল প্রণেতা। বেবিটেক্সির দুজন ছেলেকে এসএমসি 'লোড' এবং 'কক' করতে বলা হল 'সেফটি ক্যাচ' 'অফ' অবস্থায়। দু'জনের প্রত্যেকের কাছে দেয়া হলো দুটি করে 'প্রাইম' করা গ্রেনেড। বাংকারের ভেতরে অবস্থানরত শত্রুদের উদ্দেশ্যে 'লব' করার জন্য দেয়া হয়েছিল গ্রেনেডগুলি। কিছুই না বলে দৃশ্যত অকারনেই অপারেশনের সময় গুলির বাক্স কাঁধে দিয়ে সাথে নিয়ে গিয়েছিলাম মোকছেদকে। মোকছেদ বসে বসে দেখলো মিনিট দু'য়েকের মধ্যে কীভাবে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলো।

জয়পুরহাট চিনিকলের ‘এফ’ টাইপ কলোনীতে থাকে জনাব আলী। জয়পুরহাটের পাগলা দেওয়ানে শক্ত পাকিস্তানি অবস্থান আক্রমনে সহযোদ্ধা হাদীউজ্জামান শত্রুর মর্টারের স্প্লিন্টারের আঘাতে ঘাড়ে-পিঠে মারাত্মকভাবে আহত হয়। উষ্ণ রক্তে ভেসে যাচ্ছে সারা শরীর। আরেক সতীর্থ প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে হাদীউজ্জামানকে ক্রলিং করে পেছনে নিয়ে আসে। প্রচন্ড কষ্টে কাতরাচ্ছে হাদী। জনাব আলীকে সে ডাকে চাচা। চিকিৎসার জন্য কোলে করে যখন জনাব আলী তাকে নিয়ে যাচ্ছে ব্যথায় কাতর হাদীউজ্জামান ক্ষীণকণ্ঠে অনুরোধ করে, ‘চাচা, তুমি আমাকে দেশের গানটি শোনাও।’ চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে জনাব আলীর। হাদীউজ্জামানকে কোলে নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে বেসুরে গাইতে থাকে, ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।’ দেশের গান কি মৃত্যুযন্ত্রনা লাঘব করে? আমরা যারা অযথা বেঁচে আছি তারা বলবো কী করে?

শ্রীমঙ্গল চা বাগানে পাকিস্তানিদের ক্যাম্প। অফিসাররা থাকে ম্যানেজারের বাংলোয়। বাংলোর আশপাশে যাওয়ার জো নেই। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা পাকিস্তানিদের। যুদ্ধের মাঠে দেশপ্রেম এক উম্মাদনার নাম। আলী আজগর এবং তার এক সহযোদ্ধা মিলে পরিকল্পনা করলো বাংলোর সামনে কাঁচা রাস্তায় এম-১৪ এন্টি-পারসোনাল মাইন লাগবে। আস্তানার এতো কাছে মুক্তিবাহিনী আসবে শত্রুরও কল্পনার বাইরে। রাস্তার দু’পাশে ঘন চা বাগান। চারটি করে আটটি মাইন লাগাবে তারা। আলী আজগর যখন তার শেষ মাইনটি গর্তের ভেতরে ঢোকাচ্ছে, তখন হঠাৎ খেয়াল করলো চারজন পাকিস্তানি অফিসার গল্প করতে করতে বাংলোর দিকে হেঁটে আসছে। খামখেয়ালি ভাব। আজগরের অবস্থান থেকে পাকিস্তানিদের এবং মাইন পাঁতায় ব্যস্ত তার বন্ধুর দূরত্ব প্রায় সমান। ডাকতে গেলে পাকিস্তানিরা শুনে ফেলবেই শুধু তাই নয়, তাকে দেখেও ফেলবে। দূরত্ব মাত্র দশ-বারো গজ অথচ তার বন্ধুর পিঠ তখন শত্রুর দিকে। এতটুকুও আঁচ করতে পারছে না সে। সেকেন্ডের অংশভাগে সিদ্ধান্ত নিতে হলো আলী আজগরের। নিরুপায় হয়ে গড়িয়ে ঢুকে গেলো ঘন চা বাগানের ভেতর। শত্রুরা খেয়ালই করতে পারল না। সহযোদ্ধা বন্ধুটি ধরা পড়লো মাইন লাগানো অবস্থায়। একদম সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হলো অস্ত্রের আর বুটের আঘাত। মাইনের ভয়ে এরা আর স্থানত্যাগও করছে না। পরিণতি নির্ণীত, মুহূর্তেই বুঝে ফেললো যোদ্ধা। শরীরের সব শক্তি দিয়ে নিজেকে একটু হালকা করে নিলো। তারপর একটু আগে নিজের পোঁতা একটি মাইনের উপর ডান পায়ের সজোরে আঘাত। চোখের পলকে বিকট শব্দে উড়ে গেল সবাই-আমরা নাম ধাম কিছুই জানি না সে মুক্তিযোদ্ধাও।

পাঁচ নম্বর সেক্টরের বালাট সাব-সেক্টরে যোদ্ধা নিজামউদ্দিন লস্কর। এপ্রিলেই উপস্থিত সীমান্ত পার হয়ে ভারতে। সুনামগঞ্জ অঞ্চল তখনো বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সাংগঠনিক আওতায় আসেনি। ৫/৫ গুর্খা রেজিমেন্টে আগত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। কঠোর প্রশিক্ষণ, জীর্ণ খাবার। সকালে এক ঘন্টার পিটি শেষ করে লস্কর এলুমিনিয়ামের থালা আর মগ নিয়ে লঙ্গরে গেছে খাবার আনতে। থালায় দেয়া হলো চাল, ডাল আর পাথরকুচি মিশ্রিত লেইজাতীয় একরকম খাবার। তারপরও খেতে হবে, বেঁচে থাকার জন্য। হাতে থালা নিয়ে খাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে লস্কর। তখনো সে জানে না একজোড়া চোখ নিবিষ্ট তার ওপর। সতেরো-আঠারো বছরের এক যুবক চোখে ছলছল জল নিয়ে থালা হাতে লস্করের দিকে তাকিয়ে আছে। লস্কর জিজ্ঞাসা করে, ‘খাবে না’? আরশ আলী নিচুস্বরে জবাব দেয়, ‘ওরা আমাদের দেশটা কেড়ে নিয়েছে মুখের গ্রাস তো এর তুলনায় কিছুই না। খাই কী করে?’ নিজামউদ্দিন লস্করের রণাঙ্গনের ওপর একটি লেখা পড়েই আমি তার ভক্ত হয়ে গেছি। কোনো পরিচয় নেই তার সাথে, আলাপচারিতাও না। আমার উপর্যুপরি অনুরোধে সব কাজ ফেলে সিলেট থেকে এসেছেন ঢাকায় আমার কাছে। ন’মাসের কতো কাহিনী। লস্করের চোখ বরাবর ভিজে যাচ্ছে। চোখের পানি লুকাতেও চেষ্টা করছেন না। বলতে বলতে বলেন, তখন জানতাম না আরশ আলী আমার সঙ্গে যুদ্ধে যাবে, জানতাম না আরশ আলী আমারই সামনে মাথায় গুলি খাবে

যুদ্ধের মাঠে, আমি তাকে কলেমা শোনাবো, আমারই সামনে সে মারা যাবে, স্বাধীনতার পর তার নামে স্কুল হবে সুনামগঞ্জ থেকে সিলেট আসার পথে জয়কলসের রাস্তার ধারে, যেখানে সে শেষঃনিশ্বাস ত্যাগ করেছিল এবং জানতাম না তার নামের সে সাইনবোর্ডটিও আবার একদিন মুছে ফেলা হবে।' সাইত্রিশ বছর পার হতে চলল, এখনো মাঝে-মধ্যে সকালে খিচুরির প্লেট সামনে এলে লস্কর তাকিয়ে থাকে ফ্যাল ফ্যাল করে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে আরশ আলীর বেদনাক্রান্তমুখ, 'খাই কী করে?'

২৪ এপ্রিল, একাত্তর। ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে শুভপুর ব্রিজ থেকে চট্টগ্রামের দিকে মাইল তিন গেলে করেরহাট। এক সময়ের ছোটখাটো ব্যাবসা কেন্দ্র। পাকিস্তানি পশুদের নৃশংসতায় বিরান হয়ে আছে। মানুষ নেই, পশু-পাখীও ঘর ছেড়েছে। খাঁ খাঁ রোদ্দুরের উত্তাপ উপেক্ষা করে কেবল শ'খানেক ইপিআর সৈন্য তাদের প্রতিরক্ষা অবস্থান তৈরিতে ব্যস্ত। ক্যাপ্টেন রফিক এ যোদ্ধাদের নিয়েই বারবার শত্রুদের অগ্রাভিযান বিলম্বিত করতে এবং ওদের রক্ত ঝরাতে একের পর এক যুদ্ধ করে চলেছেন। করেরহাট বেহাত হওয়ার অর্থ বহুমাত্রিক বিপর্যয়। শুভপুর ব্রিজ শত্রুর দখলে চলে যাবে, যার অর্থ ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক শত্রুর নিয়ন্ত্রনে চলে যাওয়া। এখান থেকে একটি রাস্তা পূবদিকে পাহাড়ের ভেতরে চলে গেছে রামগড়। তখনো রামগড়ে মুক্তিযোদ্ধারা পুনঃসংগঠিত হচ্ছে। ওরাও মারাত্বক হুমকির সম্মুখীন হবে। ক্যাপ্টেন রফিক আর তার সহযোদ্ধারা রণক্লান্ত। সৈন্যসংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের অভাব আর গোলাবারুদের স্বল্পতা ক্যাপ্টেন রফিককে ভীষনভাবে ভাবিয়ে তুলছে। রসদ নেই, নেই একবেলা আহারেরও কোনো নিশ্চয়তা। তারপরও শত্রুর আসন্ন অগ্রাভিযান রুখতে হবে। অনিবার্য যুদ্ধ, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। এতো সীমাবদ্ধতা নিয়ে সুসংগঠিত ও সুসজ্জিত শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করা অসম্ভব। তবুও এ লড়াই তাদের করতেই হবে। এই যোদ্ধারা ২৫ মার্চ চট্টগ্রাম থেকে বিদ্রোহ করে ক্রমাগত যুদ্ধ করে আসছে। তারপরেও তাদের কোনো অবসাদ নেই।

ঠিক এই সময়ে খবর এলো মহালছড়ি প্রতিরক্ষা অবস্থান মারাত্বক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। পাকিস্তানিদের ৩ কমান্ডো ব্যাটালিয়নের এক কোম্পানি এবং প্রায় দুই ব্যাটালিয়ন মিজো বিদ্রোহী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রায় অবরুদ্ধ করে ফেলেছে। অতিরিক্ত সেনাসদস্য চেয়ে পাঠিয়েছেন মেজর মীর শওকত আলী। অনন্যোপায় ক্যাপ্টেন রফিক ৩০ জনের একটি দল বাধ্য হয়েই পাঠিয়ে দিলেন মহালছড়ি। বাকি ৭০ জন যোদ্ধা দিয়ে বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রতিরক্ষা অবস্থান নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি যেন শত্রু মুক্তিযোদ্ধাদের সৈন্যের অপ্রতুলতা সহজে আঁচ করতে না পারে। এ হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির উন্নতির বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। ক্যাপ্টেন রফিক সে কথা জানেন। কিন্তু তারপরও তাকে তার যোদ্ধাদের উজ্জীবিত রাখতে হবে। তার এই হতাশা আর দুশ্চিন্তার কোনো বহিঃপ্রকাশই ঘটলো না। অপরিহার্য এ মরণখেলার প্রস্তুতি চলতে থাকল পূর্ণোদ্যমে।

দুপুর তিনটার মধ্যে প্রতিরক্ষা অবস্থান গ্রহণের কাজে শেষ করতেই ক্ষুধা জানান দিলো। নিজের কাছে সযত্নে রাখা সামান্য সম্বল কিছু চিড়া আর গুড় খেয়েই কাটিয়ে দিয়েছেন গত তিনদিন। আরো কয়েক মুঠ চিড়া আর কয়েক চিমটি গুড় খেয়ে সামনের খালের ঘোলা পানি দিয়ে জঠর পূর্ণ করলেন। তারপরও মনে হলো যেন অমৃত। রফিক অবসন্ন দেহ নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পেছনে করেরহাট স্কুলের কাছে এলেন। বিক্ষিপ্ত আর্টিলারির গোলাপড়া শুরু হলো আবারো। বাতাসে বারুদের গন্ধ। পাশেই তিনটি কুঁড়েঘর আগেই গোলার আঘাতে মাটিতে মিশে গেছে। ধোঁয়া বেরুচ্ছে তখনো। এর মধ্যে দু'জন মহিলা এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছেন। পাশেই পড়ে আছে রক্তস্নাত এক নিথর কিশোর। শত্রুর আর্টিলারি শেলের ধারালো স্প্লিন্টার তার পেটটা কেটে দেহ দু'ভাগ করে ফেলেছে। ক্যাপ্টেন রফিক চিৎকার করে তাদের দৌড়াদৌড়ি না করে শেলিং বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত মাটিতে শুয়ে থাকতে বললেন।

‘তোমরা কারা’? এক মহিলা ধীরপ্রশান্তে জিজ্ঞাসা করলেন গভীর বেদনাহত কণ্ঠে। ‘আমরা আপনাদেরই সন্তান’ বলা শেষ করেই শক্ত করে ধরা হাতের এসএমজিটি নিয়ে ক্যাপ্টেন রফিক পা বাড়ালেন স্কুলের দিকে। আকাশের দিকে মুখ করে ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিলেন মাঠের ঘাসে। একজন মহিলা ধীরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন মৃত কিশোরটির পাশে। দোয়ার ভঙ্গিতে কাঁপা কাঁপা দুটি হাত উঠলো আকাশে। ট্যাঙ্ক গড়িয়ে আসার শব্দ শোনা যাচ্ছে। এরই নাম যুদ্ধ। গত এক মাসে তিনি ভালোভাবেই জেনেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে সব গোলাগুলি বন্ধ হয়ে গেলো, রাজ্যের ভাবনা আসতে লাগল মাথায়। করে শেষ হবে এ যুদ্ধ, কতদূর সেই স্বপ্নসাধ-স্বাধীনতা। এরই মধ্যে কানে ভেসে আসছে শূন্যে দুটি হাত তোলা সেই মায়ের দোয়া ‘আল্লাহ, আমার প্রাণপ্রিয় ছেলেটিকে তুই নিয়ে গেছিস, সেজন্য আজ আমার কোনো অভিযোগ নেই। আমার ছেলের প্রাণের বিনিময়ে আমি শুধু এই ছেলেদের জন্য দোয়া চাইছি, যারা এই দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে।’ এক মায়ের প্রগাঢ় মমতায় মুহুর্তেই সব ভাবনা উবে গেল ক্যাপ্টেন রফিকের। গভীর আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লেন তিনি। অজান্তেই চোখের দু’পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে পানি। মনে মনে বললেন, ‘হে দয়াময় খোদা, এই দুখিনী মায়ের দোয়া তুমি দয়া করে কবুল করো।’

হাজারো ছেলের বুকের রক্ত আর সন্তান হারানো হাজারো দুখিনী মায়ের চোখের জল করুনাময় প্রভু কবুল করেছেন। এই আমি আর আপনি যদি তা বুঝতাম।

২৫ মার্চের আক্রমনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে অবস্থিত পাঁচটি ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন সক্ষমভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। বাঙালি এ সৈনিকরা তাদের প্রাক্তন প্রভুদের রণকৌশল এবং মনন সম্বন্ধে অবহিত ছিল বলে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সহজ হয়। প্রাথমিক প্রতিরোধ শেষে মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে ব্যাটালিয়নগুলি ভারতে আশ্রয় নেয়। তাদের বিশ্রাম ও পুনঃগঠন অপরিহার্য হয়ে পরে। এ পর্যায়ে ব্যপকভাবে গণযোদ্ধাদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়নগুলির সৈন্য সংখ্যার ঘাটতি পূরণ করা হয়। ১৫ থেকে ৪৫ বছরের কিশোর-পৌঢ়রা শ’য়ে শ’য়ে স্বেচ্ছায় লাইনে দাঁড়িয়ে যেতো। উচ্চতার চাহিদা ছিল ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। পাঁচ ফুটের নীচের উচ্চতার যশোর শহরের ছেলে মহিউদ্দীন তাকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করতে ক্যাপ্টেন হাফিজ উদ্দিনকে অনুনয় করতে থাকে। এক পর্যায়ে সে ক্যাপ্টেন হাফিজের জীপের সামনে আড়াআড়িভাবে শুয়ে পড়ে। অন্যরা তাকে চ্যাংদোলা করে দাঁড়া করায়। সে ক্যাপ্টেন হাফিজকে বলে, ‘স্যার, বুকের মাপ আর উচ্চতা দেখে ভর্তি করলে চলবে না। আপনারা শত্রুর অবস্থান দেখিয়ে দেন এবং আমাদের দেন গ্রেনেড। আপনাদের চোখের সামনে দিনে দুপুরে যে শত্রুর উপর গ্রেনেড ছুড়ে আসতে পারবে, তাকেই নেবেন সেনাবাহিনীতে। ১৪ ডিসেম্বর ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট যখন সিলেটের এম. সি. কলেজ আক্রমন করে আমাদের মহিউদ্দীন সে যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

নিয়মানুযায়ী একটি পদাতিক ব্যাটালিয়নে চারটি কোম্পানি থাকে-এ, বি, সি ও ডি। মুক্তিযুদ্ধের সময় গণযোদ্ধাদের সমন্বয়ে ‘ই’ বা ‘ইকো’ কোম্পানি নামে প্রত্যেকটি ব্যাটালিয়নে একটি কোম্পানি সংযোজিত হয়। ‘ইকো’ কোম্পানিগুলোর সাফল্য কিংবদন্তিতুল্য।

যুক্তিনির্ভর অনুমান অনুযায়ী প্রশিক্ষিত সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ১,২০,০০০। সেনা, নৌ, বিমান বাহিনী, ইপিআর, পুলিশ, আনসার, মুজাহিদসহ মোট প্রচলিত সৈনিক ছিল ৪২,০০০। অর্থাৎ ৭৮,০০০ ছিল গণযোদ্ধা যার ৮৫% ছিল কিশোর-তরুণ যোদ্ধা অর্থাৎ ৬৬,৩০০। এই মাটিবর্তী মানুষ তাদের সর্বস্ব দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন দিয়েছে। এমন হতো যে আমরা যে গ্রামে অবস্থান নিয়ে এম্বুশ পরিচালনা করতাম এবং পাকিস্তানিরা পরে এসে সে গ্রামের লোকজনকে হত্যা করতো, ঘরবাড়ি

জ্বালিয়ে দিতো, নারীদের নির্যাতন করতো, গবাদি পশু নিয়ে যেতো। তারপরও এমন কখনো হয়নি কোনো গ্রামের মানুষ আমাদের অবস্থান গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তারা শত্রু অবস্থান ও সংখ্যা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে দিতো, আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতো, এ্যামুনিশন ও ভারি সরঞ্জাম বয়ে নিয়ে যেতো। আমাদের শহীদদের জানাজা এবং কবরের ব্যবস্থা করতো এবং আহতদের বহন ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতো। এক কথায় যা প্রয়োজনীয়, যা সম্ভব এমনকি যা অসম্ভব তাও এই আমজনতা আমাদের জন্য করেছে, এ দেশের স্বাধীনতার জন্য করেছে। এই ব্রাত্যজনদের চিরকালীন স্মারক হয়ে থাকার কথা এই স্বাধীন দেশের জনপদে। অথচ তারা আজ কোথাও নেই আমাদের 'আমিত্বে'র দাপটে। আমাদের চৈতন্যে কদাচিৎ আসে যে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা মৃম্ময়ী কোনো বস্তু নয়, গোটা বিষয়টাই চিম্ময়ী।

চীন, ভিয়েতনাম ও কিউবায় জনযুদ্ধ বা Peoples War সংগঠিত হয়। কিন্তু এদের যুদ্ধ ছিল একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শ বা কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। অকম্যুনিস্টরা তাতে অর্ন্তভূক্ত হয়নি, স্বভাবতই। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্টীকে অর্ন্তভূক্ত করেছিল। আমাদের মুক্তিযুদ্ধই প্রকৃত জনযুদ্ধ। উচ্চবর্গের মানুষরা সমুখ সমরে অংশগ্রহণ করেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, সরকারী আমলা, উকিল-ব্যারিস্টার, বিত্তশালী ব্যবসায়ী, মসজিদের ইমাম, মাদরাসার মুয়াল্লিমদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার অহংকার নেই।

ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহের মস্তিস্ক প্রসূত 'সাব-অলটার্ন হিস্টরি'-র অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কত আবশ্যক, আমরা যদি তা উপলব্দি করতাম! বর্তমানের জন্য নয় ভবিষ্যতের জন্য এ বীরগাথা রেখে যাওয়া দরকার। বর্তমান বসে থাকে না। দীনতার কারণে তা করতে ব্যর্থ হলে ভবিষ্যৎ কালিমাময় হয়ে যাবে। করণীয় কাজ যদি কোনোদিন কেউ না করে তাহলে কোথাও পৌছানো যাবে না।

আমি ভবিষ্যৎ বক্তা নই, আগামীতে কী হবে জানি না। তবে একথা নিশ্চিত জানি এ দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়ক আমাদের দেশের গণমানুষ এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রতিরক্ষার জন্য আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে সাথে নিয়ে এই গণমানুষই হবে স্বাধীনতা রক্ষার মূল নিয়ামক।

বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রু ধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা
স্বর্গ কি হবে না কেনা।
বিশ্বের ভান্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন।

লেখক-চেয়ারম্যান ও প্রধান গবেষক-সেন্টার ফর বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার স্টাডিজ। ই-মেইলঃ cblws1971@ yahoo.com. Cell: 01711-536500